بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৪ জুলাই, ২০২৩ মোতাবেক ১৪ ওয়াফা, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বদরের যুদ্ধের বরাতে মহানবী (সা.)-এর জীবনী এবং বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। বদরের যুদ্ধ সমাপ্ত হয় এবং কাফিরদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রাপ্য মন্দ পরিণামের সম্মুখীন করেন, যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে। (এ যুদ্ধে) ৭০জন কাফির মারা যায় যাদের মধ্যে অনেক নেতা এবং সর্দারও ছিল। এসব কুরাইশ নেতার দাফন সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে এভাবে রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) কা'বার পাশে নামায পড়ছিলেন। [পেছনের সকল ঘটনা বা অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে] কুরাইশের কয়েকজন ব্যক্তির প্ররোচনায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা ব্যক্তি সিজদারত অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর কাঁধের মাঝখানে পশুর নাড়িভুড়ি রেখে দেয়। মহানবী (সা.) সিজদাতেই পড়ে থাকেন আর তারা (শত্রুরা) হাসতে থাকে। (তখন) হযরত ফাতেমা আলাইহাস সালামকে কেউ এ বিষয়টি অবগত করে। তখন তিনি অল্প বয়স্কা এক বালিকা ছিলেন, তিনি ছুটে আসেন আর (তখনও) মহানবী (সা.) সিজদায় পড়ে ছিলেন এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর ওপর থেকে সেটি সরিয়ে দেন। হযরত ফাতেমা (রা.) তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন। মহানবী (সা.) নামায পড়া শেষ করার পর দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশদের পাকড়াও করো। হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশদের পাকড়াও করো। হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশদের পাকড়াও করো। এরপর তিনি (সা.) নাম উল্লেখ করে দোয়া করেন যে, **হে আল্লাহ্! আমর বিন হিশাম, উতবা বিন রবীয়্যা, শেয়বা বিন রবীয়্যা, ওয়ালীদ বিন উতবা, উমাইয়্যা বিন খালাফ, উকবা বিন আবী মুয়ায়েত এবং উম্মারা বিন ওয়ালীদকে পাকড়াও করো**। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! বদরের দিন আমি স্বয়ং তাদেরকে (রণক্ষেত্রে) পড়ে থাকতে দেখেছি যাদের নাম মহানবী (সা.) উল্লেখ করেছিলেন। এরপর তাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে বদরের বিভিন্ন গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর মহানবী (সা.) বলেন, গর্তবাসীরা! অভিসম্পাতের আওতায় রয়েছে।

অনুরূপভাবে জীবনী গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, মহানবী (সা.) মুশরিকদের মরদেহগুলো তাদের নিহত হবার স্থান থেকে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি (সা.) যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বেই তাদের নিহত হবার স্থান সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলেন। যেমন হযরত উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) আমাদেরকে (পূর্বেই) বদরের (যুদ্ধে) নিহত মুশরিকদের মারা যাবার স্থান দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি (সা.) এসব নিহত হবার স্থান দেখিয়ে বলছিলেন, ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল উতবা বিন রবীয়্যা এখানে নিহত হবে; শেয়বা বিন রবীয়্যা এখানে নিহত হবে; উমাইয়্যা বিন খালাফ এখানে নিহত হবে; এটি হবে আবু জাহল বিন হিশামের নিহত হবার জায়গা আর এটি হবে অমুকের নিহত হবার স্থান। তিনি (সা.) তাঁর পবিত্র হাত মাটিতে রেখে এ স্থানগুলো চিহ্নিত করছিলেন। পরবর্তী দিন বদরের

যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছিল তাদের মরদেহগুলো যেখানে তিনি (সা.) তাঁর পবিত্র হাত রেখেছিলেন সেসব স্থান থেকে বিন্দুমাত্রও এদিক সেদিক হয়নি।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) নির্দেশ প্রদান করেন যে, নিহত সব কাফিরকে গর্তে ফেলে দাও। অতএব উমাইয়্যা বিন খালাফ ব্যতিরেকে সবাইকে (গর্তে) ফেলা হয়। তার লাশ বর্মের ভেতর ফুলে গিয়েছিল। তাকে উঠাতে গেলে তার (মরদেহ থেকে) মাংস খসে পড়তে থাকে একারণে তাকে সেখানেই মাটি ও পাথর দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) যখন মুশরিকদের মরদেহগুলোকে গর্তে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন, তখন উতবা বিন রবীয়্যার মরদহকে তুলে গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। মহানবী (সা.) উতবার পুত্র হযরত আবু হুযায়ফা (রা.)'র চেহারায় অপছন্দের ছাপ দেখতে পান। {তিনি (আবু হুযায়ফা) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তার পিতা ছিল কাফির} তিনি (সা.) বলেন, হে আবু হুযায়ফা! মনে হয় তোমার মনে তোমার পিতা সম্বন্ধে কোনো ভাবনার উদয় হয়েছে। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! না। আমার পিতা সম্পর্কেও সন্দেহ নেই আর তার নিহত হওয়া সম্পর্কেও (আমার) সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি জানতাম আমার পিতা অনেক বিচক্ষণ এবং নম্র ও সম্মানিত মানুষ ছিলেন। আমার প্রত্যাশা ছিল, এই বিষয়গুলো (অর্থাৎ তার মাঝে যে ভালো গুণগুলো ছিল তা) তাকে ইসলামের দিকে টেনে আনবে। (কিন্তু) আমি যখন তার পরিণাম দেখলাম তখন আমার তার কুফরীর কথা মনে পড়লো, অথচ আমার একান্ত আশা ছিল যে, সে ইসলাম গ্রহণ করবে। এ বিষয়টি আমাকে দুঃখভারাক্রান্ত করেছে। মহানবী (সা.) আবু হুযাইফার জন্য কল্যাণ কামনা করে দোয়া করেন এবং তার মঙ্গল কামনা করেন।

হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন কুরাইশ নেতাদের মধ্য হতে ২৪জন সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করলে তাদেরকে বদরের কূপগুলোর মধ্য হতে একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়। আর তিনি (সা.) যখন কোনো জাতির বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতেন তখন তিনি (সেই) ময়দানে তিন রাত অবস্থান করতেন। তিনি (সা.) যখন বদরের (প্রান্তরে) অবস্থান করেন আর তৃতীয় দিন আসে তখন তিনি (সা.) তাঁর উটনীর ওপর হওদা বাঁধার নির্দেশ দেন, এরপর তার ওপর হওদা বেঁধে দেয়া হয়। এরপর তিনি (সা.) যাত্রা করেন আর তাঁর সাহাবীরাও তাঁর সাথে যাত্রা করেন আর বলেন, আমাদের ধারণা হয় যে, তিনি কোনো উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছেন। তিনি (সা.) সেই কূপের কিনারায় পৌঁছে দাঁড়ান যেখানে কাফিরদেরকে কবরস্থ করার জন্য নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি (সা.) সেসব নিহতের নাম ও তাদের পিতাদের নাম নিয়ে ডাকতে থাকেন যে, হে অমুকের পুত্র অমুক,! হে তমুকের পুত্র তমুক! তোমরা যদি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে তাহলে এখন কি তোমরা আনন্দিত হতে না? কেননা আমাদের প্রভু আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য প্রমাণিত হতে দেখছি, তোমরাও কি সত্যিকার অর্থেই তা পেয়েছ যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের প্রভু তোমাদের দিয়েছিলেন? আবু তালহা (রা.) বলতেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এসব মরদেহের সাথে কি কথা বলছেন? এদের মাঝে তো প্রাণ নেই, এরা মৃত মানুষ। মহানবী (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ রয়েছে! আমি যা বলছি তা তুমি তাদের চেয়ে বেশি শুনছ না। সীরাত ইবনে হিশাম-এ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হে কূপবাসীরা! তোমরা তোমাদের নবীর অতি নিকৃষ্ট স্বজন ছিলে, তোমরা আমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছ অথচ অন্যরা আমার সত্যয়ন করেছে। তোমরা আমাকে স্বগৃহ থেকে বিতাড়িত করেছ

অথচ অন্যরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, তোমরা আমার সাথে যুদ্ধ করেছ অথচ অন্যরা আমাকে সাহায্য করেছে। এরপর বলেন, **هل وجدتم ما وعدكم الله حقا فانى وجدت ما وعدنى الله حقاً** (উচ্চারণ: **হাল ওয়াজাদতুম মা ওয়াদাকুম রাব্বুকুম হাক্বা**') অর্থাৎ তোমাদের প্রভু তোমাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ? সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই ঘটনাটি এভাবে লিখেছেন,

(বদরের প্রান্তর থেকে) ফিরে আসার পূর্বে মহানবী (সা.) সেই গর্তের কাছে যান যেখানে কুরাইশ নেতাদের কবরস্থ করা হয়েছিল এবং এরপর তাদের একেক জনের নাম নিয়ে ডাকেন এবং বলেন, **هل وجدتم ما وعدكم الله حقا فانى وجدت ما وعدنى الله حقاً** অর্থাৎ তোমরা কি সেই প্রতিশ্রুতিকে সত্য প্রমাণিত হতে দেখেছ যা খোদা তা'লা আমার মাধ্যমে তোমাদের সাথে করেছিলেন? আমি নিশ্চিতভাবে সেই প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছি যা খোদা তা'লা আমার সাথে করেছিলেন। আরো বলেন, **اهل القليب بئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم كذبتمونى و صدقنى الناس و اخرجتمونى و اوانى الناس و قاتلتمونى و نصرنى الناس** (উচ্চারণ: **আহালাল কালীবে বেয়সা আশিরাতিন নবীয়্যে কুনতুম লি নবীয়্যেকুম কাযাবতুমুনী ওয়া সাদাকানীন্ নাসি ওয়া আখরাজতুমুনী ওয়া আওয়ানিন্ নাসি ওয়া কাতালতুমুনী ওয়া নাসারিয়ান্ নাসি**) অর্থাৎ 'হে গর্তে পড়ে থাকা ব্যক্তিরা! তোমরা তোমাদের নবীর অতি নিকৃষ্ট স্বজন সাব্যস্ত হয়েছ। তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদি বলে প্রত্যাখ্যান করেছ অথচ অন্যরা আমার সত্যয়ন করেছে। তোমরা আমাকে আমার মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছ কিন্তু অন্যরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ আর অন্যরা আমায় সাহায্য করেছে। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তারা এখন মৃত, তাদের জন্য শোনা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে? তিনি (সা.) বলেন, আমার এই কথা তারা তোমাদের চেয়ে ভালো শুনতে পাচ্ছে। অর্থাৎ তারা এখন সেই জগতে পৌঁছে গেছে যেখানে সকল সত্য বাস্তব রূপে প্রকাশ পায়, কোনো পর্দা (আর) বাকি থাকে না। মহানবী (সা.)-এর এই বাক্যাবলী, যেগুলো এখনই বর্ণিত হয়েছে, নিজের মাঝে এক অদ্ভুত ব্যথা ও বেদনার মিশ্রণ রাখে আর এগুলোর মাধ্যমে হৃদয়ের সেই অবস্থার কিছুটা ধারণা পাওয়া সম্ভব যা সেই সময় মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে বিরাজমান ছিল। এমন মনে হয় যে, তখন কুরাইশের বিরোধিতার অতীত ইতিহাস তাঁর চোখের সামনে ছিল আর তিনি কল্পনার জগতে এর এক একটি পৃষ্ঠা উল্টে যাচ্ছিলেন। আর তাঁর হৃদয় সেসব পৃষ্ঠা পাঠে বিচলিত ছিল। তাঁর (সা.) এই শব্দাবলী এই কথারও নিশ্চিত প্রমাণ যে, একের পর এক সংঘটিত যুদ্ধ আরম্ভ করার দায় সম্পূর্ণরূপে মক্কার কাফিরদের ওপর ছিল। যেমনটি তাঁর শব্দাবলী **و قاتلتمونى و نصرنى الناس** (**'কাতালতুমূনী ওয়া নাসারানিয়ান নাসি'**) থেকে প্রকাশিত। অর্থাৎ হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আমার সাথে যুদ্ধ করেছ অথচ অন্যরা আমাকে সাহায্য করেছে। এই শব্দাবলীর মাধ্যমে কমপক্ষে এতটুকু অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.) স্বস্থানে এই বিশ্বাসই রাখতেন যে, এসব যুদ্ধের সূচনা কাফিরদের পক্ষ থেকেই হয়েছে আর তিনি (সা.) অপারগ হয়ে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে তরবারি হাতে তুলে নিয়েছেন।

এই যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনাবলীরও উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মধ্য থেকে একটি ঘটনা সীরাত গ্রন্থে এভাবে বিদ্যমান যে, ইবনে ইসহাক বলেন, উকাশা বিন মিহসান (রা.) বদরের দিন নিজের তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করতে থাকেন। এমনকি তা তার হাতে ভেঙে

যায়। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তখন তিনি (সা.) তাকে একটি লাকড়ি দান করে বলেন, হে উকাশা! তুমি এটি দিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। উকাশা সেটিকে হাতে নিয়ে দোলা দিতেই লাকড়িটি তার হাতে তরবারি হয়ে যায়, যা বেশ দীর্ঘ ছিল এবং যার লোহা অনেক কঠিন ছিল আর তার রঙ ছিল শুভ্র। তিনি সেটি দিয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিজয় দান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, সেই তরবারির নাম ছিল **'অওন'**। পরবর্তী যুদ্ধসমূহেও তিনি উক্ত তরবারি দ্বারা বীরত্বের পরিচয় দিতে থাকেন, যতক্ষণ না মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

এরপর নিদর্শন স্বরূপ মুখের লালা আর পবিত্র হাতের প্রভাবের উল্লেখও পাওয়া যায়। হযরত কাতাদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন তার চোখে আঘাত লাগে। তার চোখ তার গালে গড়িয়ে পড়ে, অর্থাৎ অক্ষিগোলক বের হয়ে বাইরে চলে আসে। তিনি সেটিকে নীচে ফেলে দেয়ার ইচ্ছা করেন। সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা.) বলেন, না, এমনটি কোরো না। তিনি (সা.) হযরত কাতাদাকে নিজের কাছে ডাকেন আর নিজের হাতের তালুতে তার চোখটি রাখেন। এরপর সেটিকে তিনি তার স্বস্থানে রেখে দেন। অর্থাৎ অক্ষিগোলকটি পুনরায় অক্ষিকোটরে রেখে দেন। তিনি বলেন, এরপর তার মনেই ছিল না যে, তার কোন্ চোখে আঘাত লেগেছিল। চোখটি এরপর এমনভাবে ঠিক হয়ে যায় যে, তার এই অনুভূতিই ছিল না য, এটিই সেই চোখ যা বের হয়ে এসেছিল। বরং এই চোখ অন্য চোখ থেকে সুন্দর দেখাতো। কোনো কোনো পুস্তকে চোখ সেরে ওঠার এই ঘটনাটি উহুদের যুদ্ধের বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারো কারো মতে এটি খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের ঘটনা। যাহোক, এটি একটি নিদর্শন ছিল যা বদরের প্রেক্ষিতেও বর্ণিত হয়েছে।

মক্কায় কাফিরদের পরাজয়ের সংবাদ যেভাবে পৌঁছে তার বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, মুশরিকরা বদরের ময়দান থেকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় পালাতে গিয়ে বিক্ষিপ্ত ও বিচলিত অবস্থায় মক্কার পথ ধরে। লজ্জা ও অনুশোচনায় আতিশয্যে তাদের জন্য এটি বোধগম্য ছিল না যে, তারা কোন্ মুখে মক্কায় প্রবেশ করবে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মক্কায় কুরাইশের পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে প্রবেশ করে সে ছিল **হায়সুমান বিন ইয়াস বিন আব্দুল্লাহ্**। সে পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মানুষ তার কাছে যুদ্ধের খবরাখবর জানতে চায়? সে বলে, উতবা বিন রবীয়্যা, শেয়বা বিন রবীয়্যা, আবুল হাকাম বিন হিশাম অর্থাৎ আবু জাহল, আর উমাইয়্যা বিন খালাফ এবং আরও কতিপয় নেতার নাম নিয়ে বলে যে, তারা নিহত হয়েছে। সে যখন নিহতদের মাঝে কুরাইশ সরদারদের নাম গুণতে আরম্ভ করে তখন মানুষ তার কথায় বিশ্বাস করতে পারেনি। **সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা**, যে কিনা হাতীম-এ বসা ছিল, সে একথা শুনে বলে যে, কিছুই বুঝতে পারছি না, এই ব্যক্তি হয়ত পাগল হয়ে গেছে। পরীক্ষামূলকভাবে তাকে জিজ্ঞেস করা যাক যে, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা কোথায়? অর্থাৎ, নিজের সম্পর্কেই সে জিজ্ঞেস করে। মানুষ জিজ্ঞেস করে যে, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যার কী হয়েছে? সেই ব্যক্তি বলে যে, ঐ দেখো সে তো হাতীম-এ বসে আছে। (সে বলে) আমি উন্মাদ হইনি, আমি সবকিছুই দেখতে পাচ্ছি। খোদার কসম! তার পিতা ও ভাইকে আমি স্বচক্ষে নিহত হতে দেখেছি। অর্থাৎ, এতে তার বিশ্বাস হয় যে, এই ব্যক্তি সত্য সংবাদ প্রদান করছে। মোটকথা এভাবে মক্কাবাসীরা বদরের প্রান্তরে স্পষ্ট পরাজয়ের সংবাদ পায় আর তাদের মনমস্তিষ্কে এর এতটা মন্দ প্রভাব পড়ে যে, নিহতদের জন্য বিলাপ করতে তারা নিষেধ করে দিয়েছিল, যেন মুসলমানরা তাদের দুঃখে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ না পায়। মক্কার কুরাইশের কিছু লোক

তাদের নিহতদের জন্য বিলাপ করলে তারা বলে যে, এমনটি কোরো না, অর্থাৎ অন্যরা তাদেরকে এই কথা বলে, কেননা মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তারা তোমাদের এই অবস্থায় আনন্দিত হবে। আর নিজের বন্দিদের মুক্তির জন্য কাউকে প্রেরণ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তাদের সম্পর্কে খুব ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করে নাও। অর্থাৎ, বিলাপ করা যাবে না আর নিজেদের বন্দিদের মুক্তির জন্য কোনো চেষ্টাও করা যাবে না, যেন মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা ফিদিয়া বা মুক্তিপণের বিষয়ে তোমাদের সাথে কোনোরূপ কঠোরতা না করতে পারে।

মদীনাবাসীরা বিজয়ের সুসংবাদ কীভাবে পেয়েছে আর তাদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল– এ সম্পর্কেও লেখা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) **হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)**-কে মদীনার উঁচু এলাকায় এবং **হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)**-কে মদীনার নিম্নাঞ্চলের দিকে সেই কথার সুসংবাদ প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন যা আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রসূল (সা.)-কে দান করেছিলেন। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা উক্ত সংবাদ তখন লাভ করি যখন আমরা হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)'র স্ত্রী হযরত রুকাইয়্যা বিনতে রসূল (সা.)-এর কবরের মাটি সমান করে দিয়েছিলাম। তিনি (তাদের) অনুপস্থিতিতে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) আমাকেও হযরত উসমান (রা.)'র সাথে হযরত রুকাইয়্যার শুশ্রূষার জন্য পেছনে রেখে গিয়েছিলেন। আমি আমার পিতা হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র কাছে তখন যাই যখন মানুষ তাকে ঘিরে রেখেছিল। তিনি বলছিলেন যে, উতবা বিন রবীয়্যা, শেয়বা বিন রবীয়্যা, আবু জাহল বিন হিশাম, যামআ বিন আসওয়াদ, আবুল বাখতারি, আস বিন হিশাম, উমাইয়্যা বিন খালাফ, আর হাজাজ-এর দুই পুত্র নুবায়ে ও মুনাব্বেকে হত্যা করা হয়েছে। অপর দিকে মদীনায় এই অবস্থা ছিল যে, মুনাফিক ও ইহুদীরা সর্বত্র গুজব ছড়িয়ে রেখেছিল যে, মুসলমানরা চরমভাবে পরাজিত হয়েছে আর নাঊযুবিল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা.)ও নিহত হয়েছেন। এসব অপপ্রচারে সৃষ্ট ঘোলাটে অবস্থার মাঝে হযরত যায়েদ (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর উটনীতে আরোহিত অবস্থায় মদীনায় প্রবেশ করেন তখন ইহুদী ও মুনাফিকরা আরও বড় গলায় একথা বলতে আরম্ভ করে যে, দেখেছ! মুহাম্মদ (সা.) নিহত হয়েছেন আর (তাঁর) উটনীতে বসে যায়েদ আসছে। হযরত যায়েদ (রা.) যখন এই কথা বলতে আরম্ভ করেন যে, উতবাও নিহত হয়েছে, শেয়বাও নিহত হয়েছে, আবু জাহলও নিহত হয়েছে, উমাইয়্যাও নিহত হয়েছে, তখন মুনাফিকরা বলতে আরম্ভ করে যে, এটি কীভাবে সম্ভব! মনে হয় মুসলমানদের পরাজয় এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর কারণে যায়েদ (রা.) হুশজ্ঞান হারিয়ে বসেছে তাই সে এধরনের কথা বলছে। মক্কার কাফিরদের যে প্রতিক্রিয়া ছিল, মদীনার মুনাফিক এবং ইহুদীদেরও ছিল ঐ একই অবস্থা। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বলেন, আমি যেহেতু মদীনাবাসীর সব কথা শুনছিলাম তাই আমি আমার পিতা যায়েদ (রা.)-কে একপাশে ডেকে নিয়ে যাই আর জিজ্ঞেস করি, হে আমার পিতা! আপনি যা বলছেন তা কি আসলেই সত্য? তিনি বলেন, হে আমার পুত্র! আল্লাহ্‌র শপথ! এমনটিই হয়েছে, আর আমি যা বলছি তা একেবারেই সত্য। মদীনাবাসী এই খবর শুনতেই বিজয়ী নবীর কাফেলাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মুসলমানরা এই বিজয়ে উল্লোসিত ও উৎফুল্ল ছিল। মহানবী (সা.)-এর প্রত্যাবর্তনের জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন। এই যুদ্ধে সকল মুসলমান শামিল হয় নি, কেননা মদীনা থেকে যাত্রাকালে তাদের মনে যুদ্ধ হবে- এই মর্মে কোনো ধারণাই ছিল না। মহানবী (সা.)-এর আগমনের খবর পেয়ে কতিপয় মুসলমান স্বাগত জানানোর জন্য মদীনার বাইরে চলে আসে। 'রওয়াহা'

নামক স্থানে মহানবী (সা.)-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তাদের আনন্দ দেখার মতো ছিল। তারা মহানবী (সা.)-কে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য অভিবাদন জানাতে থাকেন। এরপর মহানবী (সা.) মদীনায় আসেন। সেখানে উপস্থিত সকল মুসলমান তাঁকে (সা.) স্বাগত জানায়।

এই যুদ্ধে গণিমতের মালের বিষয়ে এভাবে বর্ণিত আছে যে, উক্ত বিজয়ের ফলে মুসলমানদের হাতে গণিমতের মাল হিসেবে একশ পঞ্চাশটি উট এবং দশটি ঘোড়া আসে। এছাড়া সবধরনের সাজসরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-আশাক আর অগণিত পশুর রঙ করা চামড়া এবং উল ইত্যাদি ছিল যেগুলো মুশরিকরা নিজেদের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল। মহানবী (সা.) নিজের জন্যও সাহাবীদের সমপরিমান অংশ নির্ধারিত করেন। এ যুদ্ধে (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে) একটি তরবারি সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর জন্য পৃথক করে রেখেছিলেন এবং আবু জাহলের সম্পদ থেকে একটি উট মহানবী (সা.) লাভ করেছিলেন যার নাকে রুপার নথ পরানো ছিল। উক্ত তরবারি এবং উটকে জীবনী গ্রন্থাবলীতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ হলো, যে তরবারির বিষয়ে ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে সেটির নাম ছিল **'যুলফিকার'** এবং এর মালিক ছিল **আস বিন মুনাব্বা' বিন হাজ্জাজ** নামক এক মুশরিক, যে বদরের যুদ্ধে নিহত হয়। কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী উক্ত তরবারি ছিল আবু জাহলের। মহানবী (সা.) উক্ত তরবারির নাম যুলফিকার বলবৎ রাখেন। যুলফিকার নাম রাখার কারণ হিসেবে যে যুক্তি দেয়া হয়েছে তাহলো, সেই তরবারির কিছু অংশ দাঁত সদৃশ বানানো ছিল বা খোদাইকৃত লাইন ছিল। উক্ত তরবারির বিষয়ে লেখা আছে, সেটি পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কখনো পৃথক হয় নি। বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.) সেই তরবারি সবসময় নিজের কাছে রাখতেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর সেই তরবারি আব্বাসী খলীফাদের তত্ত্বাবধানে থাকে। একইভাবে আবু জাহলের যে উট মহানবী (সা.) বদর যুদ্ধের মালে গণিমত হিসেবে পেয়েছিলেন, সেটি মহানবী (সা.)-এর কাছেই ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.) সেটিকে কুরবানীর উদ্দেশ্যে নিয়ে যান। এ বিষয়ে একটি ঘটনা জানা যায় যে, সেই উট হুদায়বিয়ার প্রান্তরে চরে বেড়াচ্ছিল এবং একসময় সেটি পালিয়ে যায় আর আবু জাহলের ঘরে গিয়ে ওঠে। হযরত আমর বিন আনআমা আনসারী (রা.) সেটির পিছু নেয় কিন্তু মক্কার কতিপয় ক্ষেপাটে লোক সেটি ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সুহায়েল বিন আমর যে হুদায়বিয়ার সময় কুরাইশের প্রতিনিধি ছিল, সে তাদেরকে সেই উট ফেরত দেয়ার আদেশ দেয়, ফলে সেটি ফেরত দেয়া হয়। সে তাদেরকে বলে, তোমরা এর পরিবর্তে একশ উট দেয়ার প্রস্তাব দাও। মুসলমান যদি তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয় তাহলে তোমরা এই উট রেখে দিতে পারো, অন্যথায় এই উট ফেরত দিতে হবে। মহানবী (সা.) (উক্ত প্রস্তাব শুনে) বলেন, আমরা যদি এটিকে কুরবানীর পশুগুলোর অন্তর্ভুক্ত না করতাম তাহলে তাহলে আমরা ঠিকই এটিকে ফেরত দিতাম। কিন্তু এটিকে যেহেতু পূর্ব থেকেই কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাই এখন আর ফেরত দেয়া সম্ভব না। অতএব তিনি (সা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে এটিকে জবাই করে দেন।

গণিমতের মাল বিতরণের সময় মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধে শাহাদতবরণকারীদের উত্তরাধিকারীদেরকে শহীদগণের অংশ প্রদান করেন। অনুরূপভাবে মদীনায় যাদের নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন অথবা কতিপয় সাহাবী যাদের ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তাদেরকেও (গণিমতের মাল থেকে) অংশ দেয়া হয়, কেননা তারা একারণে যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি।

বদরের যুদ্ধের বন্দিদের থেকে মুক্তিপণ নেয়া এবং সাহাবীদের মতামত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের সেই বন্দিদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। মুক্তিপণের পরিমাণ ছিল চার হাজার থেকে এক হাজার দিরহাম পর্যন্ত। তথাপি যারা মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করার সামর্থ্য রাখতো না তাদের জন্য শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, তারা যদি মদীনার শিশু-কিশোরদের পড়ালেখা শিখিয়ে দেয় তাহলে তারা মুক্ত হয়ে যাবে। একইভাবে কতিপয় বন্দিকে সামান্য পরিমাণ মুক্তিপণ বা মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। মুক্তিপণের বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের রেওয়ায়েত রয়েছে, এ বিষয়ে কতিপয় রেওয়ায়েত অযৌক্তিক অস্পষ্টতার জন্ম দেয়। বিষয়টির সঠিক সমাধান হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) খুঁজে বের করেছেন। যাহোক, প্রথমে পুরো কথা বর্ণনা করে দিচ্ছি। ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ এমনকি হাদীসের গ্রন্থাবলীতেও বদরের যুদ্ধবন্দিদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত বিদ্যমান সেগুলো বেশ বিভ্রান্তিকর। প্রকৃত ঘটনা হলো, মহানবী (সা.) মুক্তিপণ গ্রহণের যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন তা ছিল একান্ত ঐশী অভিপ্রায় অনুযায়ী। সাধারণ বর্ণনানুযায়ী এটি যদিও আমি পূর্বে হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণের সময় বর্ণনা করেছি কিন্তু এখানে বর্ণনা করাও আবশ্যক মনে হয়, তাই বর্ণনা করছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, তারা যখন বন্দিদের আটক করেন অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন বন্দিদের আটক করেন তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, এই বন্দিদের বিষয়ে তোমাদের মতামত কী? হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! তারা আমাদের চাচাতো ভাই এবং আত্মীয়স্বজন। আমার মতে আপনি তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে নিন। তারা আমাদের জন্য সেসব কাফিরের মোকাবিলায় শক্তিমত্তা (বৃদ্ধির) কারণ হবে আর খুব সম্ভব অচিরেই আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দিবেন। মহানবী (সা.) বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার মতামত কি? হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! না। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে একমত নই বরং আমার মতামত হলো, আপনি তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন, আমরা এদের শিরচ্ছেদ করি, তাদেরকে হত্যা করি। আলীর হাতে আকীলকে সোর্পদ করুন যেন সে তার শিরশ্ছেদ করতে পারে এবং আমার কাছে অমুককে সোর্পদ করুন (যে বংশগতভাবে হযরত উমরের আত্মীয় ছিল) যেন আমি তার শিরশ্ছেদ করতে পারি কেননা এরা সবাই কাফিরদের নেতা এবং তাদের প্রধান। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র মতামতকে প্রাধাণ্য দেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার কথাকে প্রাধান্য দেন নি। পুনরায় হযরত উমর (রা.) বলেন, পরের দিন আমি এসে দেখি মহানবী (সা.) এবং আবু বকর (রা.) বসে বসে কাঁদছেন। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে বলুন আপনাকে এবং আপনার সাথীকে কিসে কাঁদিয়েছে? যদি আমার কান্না আসে তাহলে আমিও কাঁদব নতুবা কমপক্ষে আপনাদের উভয়ের সাথে কাঁদো কাঁদো চেহারা ধারণ করবো। মহানবী (সা.) বলেন, আমার কান্নার কারণ হলো, তোমার সাথীরা আমার সামনে বন্দিদের মুক্তিপণ নেয়ার ব্যাপারে যে প্রস্তাব দিয়েছিল সেটি। আমার সামনে তাদের শাস্তি এই গাছের চেয়ে অধিক নিকটতর দেখানো হয়েছে {সেই গাছটি মহানবী (সা.)-এর অতি নিকটেই ছিল} আর আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ (সূরা আল্ আনফাল: ৬৮) অর্থাৎ পৃথিবীতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়া কাউকে বন্দি করা কোনো নবীর জন্য সমীচীন নয়। এরপর আরো দুই আয়াত পরে বলেছেন,

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا (সূরা আল্ আনফালঃ ৭০) অর্থাৎ যে মালে গণিমত তোমরা লাভ করবে সেগুলো থেকে হালাল ও পবিত্র অংশ খাও। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য গণীমতের সম্পদ বৈধ করে দিয়েছেন। এটি সহীহ্ মুসলিমের একটি রেওয়ায়েত। এই হাদীসের প্রথমদিকের শব্দগুলো অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র ক্রন্দন এবং এরপর পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতের শব্দাবলীর বর্তমানে এ রেওয়ায়েতটি অস্পষ্ট মনে হয়, বুঝা যায় না যে, কী বলা হচ্ছে? যাহোক, এই বর্ণনাকে সঠিক ধরে নিয়ে অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থ, জীবনী গ্রন্থ ও মুফাসসিররা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন বদরের যুদ্ধের বন্দিদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নেওয়ার সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং হযরত উমর (রা.)'র মতামতকে পছন্দ করেছেন। হযরত উমর (রা.)'র জীবনচরিত প্রণেতারা পৃথক শিরোনামে, হযরত উমর (রা.)'র মতামতের প্রেক্ষিতে কুরআনের যেসব নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো লিখতে গিয়ে এটিকেও সেসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত করেন যে, বদরের যুদ্ধের বন্দিদের সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)'র প্রস্তাবকে আল্লাহ্ তা'লা প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু এটি একটি অস্পষ্ট কথা। এর কিছুই বুঝা যায় না। মনে হয়, জীবনীকার এবং মুফাসসিররা এ বিষয়টি ভুল বুঝেছেন। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটির ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তা তাঁর অপ্রকাশিত তফসীরের নোটে পাওয়া গিয়েছে যা এ বিষয়টি পরিষ্কার করে এবং সেসব রেওয়ায়েতকে খণ্ডন করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র যে ব্যাখ্যা তা সঠিক বলে মনে হয়। অযথাই হযরত উমর (রা.)'র মর্যাদা উঁচু করার জন্য মনে হয় কতক মুফাসসির এসব বর্ণনা বানিয়েছেন বা এটিকে ভুল বুঝেছেন। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা আনফালের ৬৮ নম্বর আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে লিখেন,

ইসলামের পূর্বে আরবের রীতি ছিল, আর পরিতাপের বিষয় হলো আজো! পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এ রীতি চলে আসছে যে, যুদ্ধ ও লড়াই না হলেও মানুষকে বন্দি করা হয়। তাদের গোলাম বানানো হয়। {এটি সে যুগের কথা যখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই নোট লিখেছিলেন।} এই আয়াত সেই কুৎসিত প্রথাকে রহিত করে এবং স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ প্রদান করে যে, কেবল যুদ্ধাবস্থায় এবং যুদ্ধের পরই শত্রুপক্ষের লোকদের বন্দি করা যেতে পারে। যুদ্ধ যদি না হয় তবে কাউকে বন্দি করা বৈধ নয়। এ আয়াতের অনেক বড়ো ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, মুসলমানরা যখন বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কাবাসীদের কতককে বন্দি করে তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন, তাদের বিষয়ে কী মীমাংসা করা যায়? হযরত উমর (রা.)'র মতামত ছিল, তাদেরকে হত্যা করা উচিত; হযরত আবু বকর (রা.)'র মতামত ছিল, মুক্তিপণ নিয়ে (তাদেরকে) ছেড়ে দেওয়া উচিত। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র পরামর্শ পছন্দ করেন এবং এটি সূরা আনফালের ৬৮ নম্বর আয়াত, যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো নবীর জন্য এটি বৈধ নয় যে, সে পৃথিবীতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করবে। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটির ব্যাখ্যা করতে গিয়েই বলেন, যে মতামত গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে হযরত আবু বকর (রা.)'র মত ভিন্ন ছিল, হযরত উমর (রা.)'র মত ভিন্ন ছিল। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র মতামত গ্রহণ করেন এবং মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দেন কিন্তু মুফাসসিররা বলেন, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়েছিল তখন যেন আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর এ কাজকে অপছন্দ করেছিলেন। শুধু হযরত উমর (রা.)'র কথাকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করার জন্য এ রেওয়ায়েত রচনা করা হয়েছে, তাতে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাই ক্ষুন্ন হোক না কেন!

যাহোক, তারা বলে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর কাজকে অপছন্দ করেছেন। বন্দিদের হত্যা করা উচিত ছিল এবং মুক্তিপণ নেওয়া উচিত হয় নি। এটি তাবারীর তফসীরে রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, এই তফসীর ভুল। **প্রথমত,** সে সময় পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা এমন কোনো নির্দেশ জারি করেন নি যে, বন্দিদের মুক্তিপণ নিয়ে যেন মুক্ত না করা হয়। তাই, ফিদিয়া গ্রহণ করার কারণে মহানবী (সা.) কোনোভাবেই দোষী হতে পারেন না। **দ্বিতীয়ত,** ইতিপূর্বে মহানবী (সা.) নাখলাতে দু'জন ব্যক্তির কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং খোদা তা'লা মহানবী (সা.)-এর এই কাজকে অপছন্দ করেন নি। **তৃতীয়ত,** কেবল দু'আয়াত পরেই খোদা তা'লা মুসলমানদেরকে অনুমতি প্রদান করেছেন যে, মালে গণিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে তোমরা যা-ই লাভ করো তা ভোগ করো; তা হালাল এবং পবিত্র। এই বিষয়টি কল্পনাতীত যে, মহানবী (সা.)-এর ফিদিয়া গ্রহণ করাকে খোদা তা'লা অপছন্দ করবেন আবার এভাবে অর্জিত অর্থকে হালাল এবং পবিত্র আখ্যা দেবেন। কাজেই এই তফসীর-ই ভুল আর সঠিক তফসীর এটিই যে, এই আয়াতে একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, বন্দিকে কেবল যুদ্ধের পরিস্থিতিতেই আটক করা যেতে পারে যখন শত্রুপক্ষকে মোক্ষম আঘাত হেনে পরাস্ত করা হয়। এর সাথে হযরত উমর (রা.)'র এই মতামতের কোনো সম্পর্ক নেই যে, ফিদিয়া যেন গ্রহণ না করা হয়। পবিত্র কুরআনের মুফাসসিরদের মাঝে আল্লামা ইমাম রাযী (রহ.) এবং প্রসিদ্ধ জীবনীকার আল্লামা শিবলী নোমানীও একই মত প্রকাশ করেন যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এম.এ. সাহেবও এ প্রসঙ্গে লিখেন,

মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.) বন্দিদের ব্যাপারে পরামর্শ করেন যে, তাদেরকে কী করা উচিত? আরবে সাধারণত বন্দিদেরকে হত্যা করা অথবা স্থায়ীভাবে দাস বানিয়ে নেয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পূত-পবিত্র প্রকৃতির কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত অসহ্য ছিল। তাছাড়া এ ব্যাপারে তখনো কোনো ঐশী বিধানও অবতীর্ণ হয় নি। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আমার মতে মুক্তিপণ নিয়ে এদেরকে মুক্ত করে দেয়া উচিত, কেননা (যাই হোক না কেন) এরা আমাদেরই আত্মীয়স্বজন আর হতে পারে, আগামীতে এদের মধ্য হতে ইসলামের তরে নিবেদিত মানুষ সামনে আসবে। কিন্তু হযরত উমর (রা.) দ্বিমত করেন এবং বলেন, ধর্মীয় ব্যাপারে আত্মীয়তার নামে কোনো ছাড় দেয়া উচিত নয় আর এরা এদের কৃতকর্মের দরুণ হত্যাযোগ্য হয়ে গেছে। কাজেই আমার মতে, এদের সবকটাকে হত্যা করা উচিত বরং আদেশ দেয়া উচিত, মুসলমানরা যেন নিজ হাতে নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করে। মহানবী (সা.) আপন স্বভাবসুলভ দয়ার্দ্রতার কারণে হযরত আবু বকর (রা.)'র মতামতকে পছন্দ করেন আর হত্যার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন আর আদেশ দেন যে, যেসব মুশরিক ফিদিয়া বা মুক্তিপণ প্রদান করবে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হোক। অতঃপর তদনুযায়ী ঐশী আদেশ অবতীর্ণ হয়। ফিদিয়া দেয়ার ব্যাপারে যখন ঐশী আদেশ অবতীর্ণ হয় যেমনটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)ও লিখেছেন সেখানে আবার হাদীসকে কেন্দ্র করে মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র ক্রন্দনের যুক্তি উপস্থাপন করা অসঙ্গত মনে হয়। যাহোক, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম.এ. লিখেন,

অতঃপর প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী ১ হাজার থেকে আরম্ভ করে ৪ হাজার দিরহাম পর্যন্ত ফিদিয়া নির্ধারণ করা হয় আর এভাবে বন্দিরা মুক্ত হয়। অবশিষ্টাংশ আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

জুমু'আর পরে দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথমজন হলেন মুরুব্বী সিলসিলাহ্, রানা আব্দুল হামীদ খান কাঠগড়ি সাহেব; যিনি পাকিস্তানে ওয়াক্‌ফে জাদীদের নাযেব নাযেম মাল ছিলেন। সম্প্রতি ৭০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম চৌধুরী আব্দুল লতীফ খান কাঠগড়ি সাহেব এবং মায়ের নাম আমাতুল লতীফ সাহেবা। তাঁর পিতাও জামা'তের একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী কর্মী ছিলেন। আব্দুল হামীদ খান সাহেবের দাদা হযরত চৌধুরী আব্দুল মান্নান খান সাহেব এবং তাঁর দাদার বড়ো ভাই হযরত চৌধুরী আব্দুস সালাম খান কাঠগড়ি সাহেবের মাধ্যমে তাঁদের বংশে আহমদীয়াতের গোড়াপত্তন হয়, যারা ১৯০৩ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। আব্দুল হামীদ খান কাঠগড়ি সাহেব ১৯৭৯ সনের মে মাস থেকে মুরব্বী হিসেবে (জামা'তের) সেবা করা আরম্ভ করেন। বিভিন্ন স্থানে তার কাজ করার সুযোগ হয়েছে- পাকিস্তানেও এবং বহির্বিশ্বেও। ওকালতে তবশীরের অধীনে আগস্ট ১৯৮৫ থেকে ডিসেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত উগাণ্ডাতে ছিলেন। এরপর ওয়াক্‌ফে জাদীদের নেযামত ইরশাদের অধীনে বিভিন্ন স্থানে মুরব্বী হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এরপর ১৯৯৩ সনে ওয়াক্‌ফে জাদীদের নায়েব নাযেম মাল নিযুক্ত হন, যেখানে তিনি আমৃত্যু সেবা করেছেন। তিনি ৪৪ বছর জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তাকে আল্লাহ তা'লা এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তান দান করেছেন। এক পুত্র ডাক্তার আব্দুর রউফ খান সাহেব বর্তমানে সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ডেনমার্ক। তার পুত্র ডাক্তার আব্দুর রউফ খান সাহেব বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা সর্বদা ওয়াক্‌ফের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন। উগাণ্ডাতে যখন ছিলেন তখন সেখানে বিদ্রোহীরা ক্ষমতা দখল করে এবং বিদেশীদের (দেশ থেকে) বের করে দেয়- এটিই তার সেখান থেকে দ্রুত ফেরত আসার কারণ ছিল। উগাণ্ডায় কাজ করার সময় আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে সেখানকার মিশনারী ইনচার্জ মাহমুদ বিটি সাহেব পবিত্র কুরআন দিয়ে কাম্পালাতে তবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সে সময় সেখানে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। লোকেরা এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এই এলাকা ছাড়ার সময় আমার শ্রদ্ধেয় পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নিকটে হাসপাতাল না থাকার কারণে এবং চিকিৎসার সুযোগ না থাকায় লোকেরা তার পিতাকে সেখানে একটি কক্ষে ছেড়ে চলে যায়। (এরপর) সেই এলাকাটি বিদ্রোহীরা দখল করে নেয়। বিদ্রোহীরা সেখানে কেউ আছে কি-না তা দেখার জন্য সর্বত্র তল্লাশী চালায়। সে সময় এক বিদ্রোহী তার কক্ষে প্রবেশ করে যেখানে হামীদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন কিন্তু শুয়ে ছিলেন এবং হামীদ সাহেবকে মৃত মনে করে তারা তাকে ফেলে রেখে চলে যায়। আমার পিতা বলতেন, আমি নিচে জানালার একেবারে পাশে শুয়ে ছিলাম এবং জানালা দিয়ে গুলি আসছিল এবং সামনের দেয়ালে গিয়ে বিদ্ধ হচ্ছিল। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হলে কিছু পরিচিত লোকদের সাথে যোগাযোগ হয় আর তারা আমার পিতাকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে রক্ষা করেন।

খিলাফতের সাথে সীমাহীন হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। খুবই সাদাসিধে ও মিশুক মানুষ ছিলেন। খুতবাতে যা বলা হতো, যুগ খলীফার প্রতিটি কথায় লাব্বাইক বলতেন। কোনো ব্যাখ্যার পক্ষপাতী ছিলেন না। কেউ ব্যাখ্যা করলে যে এর অর্থ এমন, উদ্দেশ্য এটি তাহলে খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। কর্মকর্তা ও মুরব্বীদের নিজেও সম্মান করতেন এবং তার পুত্র বলেন, আমাকেও তাগাদা দিতেন। তিনি বলেন, আমি যখন

আতফালুল আহমদীয়ার সংগঠনে ছিলাম তখন একবার বলেন, যদি তুমি কর্মকর্তা ও মুন্তাযেম আতফালের কথা না মানো, অর্থাৎ কোনো কথায় তিনি মতভেদ করে থাকবেন হয়ত, তাহলে দায়িত্ব ছেড়ে দাও। তিনি বলতেন, জামা'তের ব্যবস্থাপনা ও খিলাফত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটির কথা শুনবে অথচ অপরটির কথা শুনবে না, এটা হতে পারে না। অন্যদের সাহায্য করা এবং সময়োপযোগী সংশোধন করা তার বিশেষ গুণ ছিল। একারণে কেউ অসন্তুষ্ট হলেও তিনি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। সংশোধন হয়ে গেলে তার মন জয় করতেন আর বলতেন, শুধু সংশোধন করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তিনি লিখেন, এমন অনেক সময় এসেছে যখন জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারতো। কিন্তু তিনি সর্বদা ওয়াক্‌ফকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শেষ বয়সে আমিও শ্রদ্ধেয় পিতাকে কথায় কথায় বলি ডেনমার্কে আমার কাছে চলে আসুন। তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন আর বলেন, আমি (কয়েকটি) বছর উৎসর্গ করি নি বরং জীবন উৎসর্গ করেছি। আমার সবকিছু ওয়াক্‌ফের সাথে সম্পৃক্ত। তার কন্যা হাফেযা হাসান আরা বলেন, আমার পিতা অত্যন্ত কোমল হৃদয়, স্নেহশীল, অতিথি পরায়ণ এবং খোদাভীরু মানুষ ছিলেন। দোয়ার এক ভাণ্ডার ছিলেন। আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এছাড়া খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসাও ছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসার এক বিশেষ ধরণ তার মাঝে দেখা যেতো যা সকল সম্পর্কের ওপর ছাপিয়ে যেতো। সবসময় চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দু আর কথার সূচনা ও সমাপ্তি হতো কেবলমাত্র খিলাফত এবং খলীফার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার মাধ্যমে। তিনি বলেন, এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যেও মাঝে মাঝে আসলে আমি যখন আবেগাপ্লুত হয়ে যেতাম তখন বলতেন, পৃথিবীর সকল সম্পর্কই নশ্বর। তুমি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক অটুট রাখো। বাকি সকল আত্মীয়রা ছেড়ে চলে যায় কিন্তু কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই অবিনশ্বর যিনি কখনো একা ছেড়ে যান না। এছাড়া বলেন, সর্বদা খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রেখো। অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সর্বদা বলতেন, আমি একজন ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী। আমার পুরো জীবন উৎসর্গিত। আর শেষ নিঃশ্বাস অবধি ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব পালনের আশাবাদ ব্যক্ত করতেন।

নাযেম মাল, ওয়াক্‌ফে জাদীদ- হাফিয খালিদ ইফতেখার সাহেব লিখেন, আব্দুল হামিদ খান সাহেবের সাথে প্রায় বিশ বছর কাজ করার সুযোগ লাভ করেছি। তিনি সবসময় এক প্রকৃত জীবন ওয়াক্‌ফে যিন্দেগীর ভূমিকা পালন করেছেন। বয়স এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে তিনি আমার চেয়ে বড় ছিলেন। কিন্তু খিলাফতের আনুগত্য এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার পরম মার্গেও আনুগত্যকারী হওয়ার কারণে কখনো জ্যেষ্ঠতার বড়াই করেন নি। ইনি তার সহকারী ছিলেন। তিনি বলেন, নিঃস্বার্থভাবে এই অধমের সাথে তিনি কাজ করেন। তাঁর বোঝানোর ও চাঁদার আহ্বান জানানোর রীত ছিল অত্যন্ত চিত্তকর্ষক। তিনি নবাগত কর্মী এবং মুরব্বী, মুয়াল্লিমদের প্রজ্ঞার সাথে কাজ করার পদ্ধতি বুঝাতেন। তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে পালন করতেন। সুচিন্তিত ও সঠিক মতামত রাখতেন। যদিও নীরবে এবং নিঃস্বার্থভাবে সেবা করেছেন কিন্তু ত্রিশ বছরেরও অধিককাল তার মাধ্যমে ওয়াক্‌ফে জাদীদ বিভাগ অনেক উপকৃত হয়েছে। (জীবনের) শেষ কয়েক বছরে অনেক সময় শরীর খারাপ হয়ে যেত, সন্তানরা প্রবাসে ছিল। কখনো যদি কেউ বলতো যে, কোনো এক সন্তানের কাছে চলে যান তাহলে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে বলতেন, আমি জীবন উৎসর্গ করেছি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেবা করবো। আল্লাহ্ তা'লা তাকে শেষ নিঃশ্বাস অবধি এই অঙ্গীকার পালনের সৌভাগ্য দিয়েছেন।

অর্থ বিভাগের মুরব্বী সিলসিলাহ্ মোবাশ্বের আহমদ সাহেব বলেন, ২০১৩ সালে ওয়াক্‌ফে জাদীদের অর্থ বিভাগে আমার পদায়ন হয়। আবদুল হামীদ খান সাহেব দু'টি মৌলিক নির্দেশনা দিয়ে বলেন, এই দু'টি বিষয় তোমার ডায়েরিতে টুকে নাও। প্রথমত, সকল কল্যাণের উৎসস্থল হলো খিলাফত। যেকোনো অবস্থায় আর যেকোনো মূল্যে খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কাজে কখনো আলস্য হলে সেটি ক্ষমাযোগ্য, কিন্তু মিথ্যা ও বানোয়াট কথার কোনো ক্ষমা নেই। কখনো মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলবে না। এই দু'টি নীতিকে হৃদয়ে গেঁথে নাও। আর বিশেষ করে সর্বদা আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করতে থাকা এবং দোয়া করতে থাকা, এটি তো আমাদের সবারই ঈমান ও বিশ্বাসের বিষয়। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন সফরে আমি তার সাথে থাকতাম। বার বার জোর দিয়ে বলতেন, চাঁদার আহবান জানানোর সময় কোনো ব্যক্তিকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের গুরুত্ব সম্পর্কে এতটা অবগত করতে হবে যাতে আর্থিক কুরবানী করার ক্ষেত্রে তার মাঝে আর কোনো দ্বিধা না থাকে। কেবল অর্থ চাওয়াই নয়, বরং চাঁদার গুরুত্ব তার হৃদয়ে প্রোথিত করতে হবে। তার মাঝে জামা'তের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। এরপর তার কাছে তার সাধ্যানুযায়ী চাঁদা চাইতে হবে। আর এক্ষেত্রে লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আমাদের কাজ জামা'তের সেবা করা আর জামা'তের খাতিরে সহায়তা নেয়া। জামা'তের সম্পদের প্রতি খেয়াল রাখতেন, বলতেন- জামা'তের সদস্যদের কুরবানীর ফলে চাঁদা আসে; এই অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে আমাদের সাশ্রয়ী হওয়া উচিত। যতটুক প্রয়োজন ততটুকুই যেন খরচ করা হয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেন খরচ করা না হয়। তিনি বলতেন, আমি আমার পুত্রকে বলেছি যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি জামা'তের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে ততক্ষণ তুমি আমার পুত্র। এছাড়া তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক বা দাবি নেই। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, (তার) মর্যাদা উন্নীত করুন। তার পুণ্যসমূহ তার সন্তানদের মাঝে বহাল রাখুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ ও জানাযা আমেরিকা নিবাসী মুরব্বী সিলসিলাহ্ জনাব মোবাশ্বের আহমদ সাহেবের স্ত্রী নুসরাত জাহাঁ আহমদ সাহেবার। ইনিও সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন,إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমা ১৯৭২ সনে স্বামী মোবাশ্বের আহমদ সাহেব ও তিন সন্তান সহ আমেরিকায় স্থানান্তরিত হন এবং ওয়াশিংটনে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৯৮৮ সনে তার স্বামী আমেরিকায় জীবন উৎসর্গ করার সুযোগ লাভ করেন। মরহুমা তার পুরো জীবন সাদাসিধে ভাবে এবং কৃতজ্ঞতার মাঝে কাটিয়ে দিয়েছেন। তার স্বামী মোবাশ্বের সাহেব যখন জীবন উৎসর্গ করেন তখন থেকেই তিনি মুরুব্বীর দায়িত্ব পালন করছেন। খুবই সাদামাটাভাবে এবং কৃতজ্ঞতার চেতনা নিয়ে তিনি স্বামীর সাথে জীবন অতিবাহিত করেছেন। মরহুমা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে মূসীয়া ছিলেন। নিয়মিত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে চাঁদা প্রদানকারিণী ছিলেন এবং খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। ১৯৭৭ সন হতে ২০০৭ সন পর্যন্ত তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বিভিন্ন পদে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। স্থানীয় নায়েব সদর, সদর ও রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। ইসলাম আহমদীয়াতকে প্রসারের জন্য কঠোর পরিশ্রমের সাথে তবরিগী প্রোগ্রাম প্রণয়ন করতেন। লাজনা ও নাসেরাতদের তালীম-তরবীয়তের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন। নিজের সন্তানদের উত্তম ধর্মীয় তরবীয়ত দিয়েছেন। একইভাবে জাগতিক শিক্ষাদীক্ষায় মনোযোগী করেছেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়া দুই পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়

মরহুমার ৪ সন্তানই জামা'তের সক্রিয় কর্মী, তারা ধর্মসেবার সুযোগ পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি দয়া ও ক্ষমা সুলভ আচরণ করুন। তার সন্তানদেরকেও তার দোয়া ও পুণ্যের উত্তরাধিকারী করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)